মূলকথন

ঋতি তখন এইট পার করে নাইনে। ঋভু সেভেনে উঠেছে। হঠাৎই বাড়িতে একটা ব্যাপারে বেশ পরিবর্তন দেখা গেলো। ভাই-বোনের সার্বক্ষণিক ঝগড়া আর মারামারি যেন নেই আর। ঋভুর কিছু আবদার-টাবদার থাকলে সেটা ঋতি অনায়াসেই মেনে নেয়, অথচ ক'দিন আগেও এমন ছিলো না। ভাই-বোনের এসব চাপান-উতোর নিয়ে সুলেখাকে প্রায়ই ব্যস্ত থাকতে হতো। ভগ্নির পুরনো ব্যাকরণ কেনো পড়বো–এ-প্রশ্নের সমাধান মিলতো নতুন বই কিনে দেয়ার মধ্যে। পুঁজোর কাপড় ঋভুর ক'টা হলো এবং দাম কেমন; সেটা মনে রেখেই ঋতির জন্য কিনতে হতো বাবা দেবেন মিত্রকে। আগে ঋতির জন্য কেনা হলে একই অবস্থা হতো ঋভুর ক্ষেত্রে।

– এ-গেঞ্জি-প্যান্ট একদম চলবে না মা, বাবাকে বলো। দিদির জন্য আড়াই হাজার দিয়ে থ্রি-পিস, আমার ওই আড়াই হাজারই চাই।

আড়াই হাজারে ঋভুর জন্য দু'-তিনটে হয়ে যায়।

– ওসব দাম-টামের কথা একদম চলবে না বাবা, আমারও তিনটে চাই।

বাসায় একটা ব্যাপার প্রায়ই হতো– ছেলে মায়ের দিকে থাকলে, মেয়ে একদম বাবার দিকে। হয়তো ঘণ্টাখানিক পর চিত্রটা বিপরীত হয়ে যেতো। ফলে দেবেন মিত্রকে কিছু কিনতে হলে দু'জনকে পরম যত্নে মাথায় রাখতে হতো। এমনকী ফল, মিষ্টি, ফাস্ট ফুডও দু'জনের আলাদা ছিলো। একদিন সুলেখা বললো–হ্যারে ঋভু, তুই না চিকেন খুব খাস, তো আজ কী হলোরে বাবা, আজ আইসক্রিমের দিকে ঝুঁকে পড়লি যে!

– বাবাতো বললো, আজ নাকি দিদিই চিকেন ফ্রাইয়ের কথা বলেছে। ওটা আমি খাবো না।
– ও, তাই বুঝি।
এছাড়া সুলেখার আর বলবার কিছু থাকে না।

রান্না-বান্নায়ও ছেলে-মেয়ের রুচির দিকে মাকে বিশেষ নজর দিতে হয়। একটা ব্যঞ্জনে ভাই-বোনের সম্মতি মেলে না–এ-যেন ইচ্ছে করেই বিপত্তি সৃষ্টি। কিন্তু কাউকে কিছু বলা চলে না। এমনিই প্রথম সন্তান হারিয়ে দেবেন-সুলেখা অনেক কষ্ট পেয়েছেন। একজন এমনটা করলে হয়তো কিছু বলা যেতো। কিন্তু ছেলে-মেয়ে দু'জনই যখন এমনটা করছে তখন বাবা-মাকেই ওদের রুচি-মর্জির সঙ্গে একাত্ম হতে হয় সংসারের নিয়ম মেনে। ব্যাপারটা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে দু'-চারবার আলাপ হলেও ' বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে'–এই সমাধানেই উভয়ের পরম তৃপ্তি হতো। যদিও বাবা দেবেন মিত্র এসবের সার্বভৌম পর্যবেক্ষক। আর ঘরময় এই যুযুধানে মা যেন রসুইশালায় রন্ধনকার্যের অভিনিবিষ্টা শ্রোতা।

হঠাৎই এমন পরিবর্তনে অবাক সুলেখা মিত্র। বিস্ময়ের ঘোর কাটে না বাবা দেবেন মিত্রের। স্কুল কিংবা কোচিং থেকে ফেরার পথে ঋভুর জন্য নানা খাবার নিয়ে আসে ঋতি। ঋভুর হাতে তেমন টাকা থাকবার কথা নয় এ-বয়সে। তারপরও মায়ের থেকে দু'-চার টাকা নিয়ে দিদির জন্য চকলেট নয়তো এক টাকার বাদাম নিয়ে ফেরে ঋভু। এখনও দু'জনের একটা ঘরে দু'টো বেড, একটাই পড়ার ঘর। একদিন সুলেখা দেখলো–ভাই-বোন এক বিছানায় ঘুমিয়ে আছে, অন্যটা খালি–যদিও আরও কিছুদিন পর মা-ই শোবার ঘর আলাদা করে দেয়। কিন্তু রিডিংরুমটা আর আলাদা করা যায় না–দু'জনে একই রুমে পড়ে, আড্ডা দেয়, টক-মিষ্টি ঝগড়াও বাদ যায় না। আরও পরের কথা। ঋভু কেবল কলেজে পা রেখেছে। দু'দিন বাদেই জন্মদিন। দেবেন মিত্র বললেন–তোমরা আজকাল কী সব পরো বুঝতে পারিনে। টাকা নিয়ে যাও, নিজেই চুজ করে প্যান্ট-শার্ট নিয়ে আসো। ঋভু সন্ধ্যায় বাসায় ফেরে। হাতে গোটাচারেক সুদৃশ্য শপিং ব্যাগ। ঘরে ঢুকতেই দিদি বললো–কিরে ঋভু, ক'টা নিলি! বাবাকে বেশ খসিয়েছিস মনে হয়। ঋভু নিরুত্তর। মায়ের দিকেই ব্যাগ চারটে এগিয়ে দেয় ঋভু। চারটে শপিং ব্যাগ থেকে মা-ই বের করে শহরের নামি দোকানের দামি থ্রি-পিস। ততক্ষণে বেডরুম থেকেও ঋতিও ফিরে আসে, হাতে প্যাকেট, লাল-নীল কাগজে মোড়া, সবুজ ফিতে দিয়ে বাঁধা। ঋভুর মুখে হাসি। ঋতি প্যাকেটটা দেখিয়ে বলে–কী বুঝলি, তবে এখনি খুলছি না, পরশু খুলবি। আরও বলে–আমার সামনেইতো বাবা তোকে টাকা দিলো।

ওই টাকা এই থ্রি-পিসেই শেষ হওয়ার কথা, বাকি সব কিনলি কী করে!
– তোর আর বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে মায়ের থেকেও টাকা নিলাম যে।
– ঠিক আছে, শুনে রাখলাম।